চণ্ডালিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

চণ্ডালিকা

প্রথম সংস্করণ (১১০০)　　　ভাদ্র, ১৩৪০ সাল

মূল্য—বার আনা

শান্তিনিকেতন প্রেস: শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হোলো। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্ব্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।”

প্রথম দৃশ্য

মা

প্রকৃতি, ও প্রকৃতি! গেল কোথায়! কী জানি কী হোলো মেয়েটার। ঘরে দেখতেই পাইনে।

প্রকৃতি

এই যে মা, এখানেই আছি।

মা

কোথায়?

প্রকৃতি

এই যে কুয়োতলায়

মা

আশ্চর্য্য করলি তুই! বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায়

না। ঘরের জল কোন সকালে তোলা হয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই জল নিয়ে গেল ঘরে। ঐ দেখ্, ঠোঁট মেলে গরমে কাক ধুঁকছে আমলকি গাছের ডালে। তুই এই বৈশেখের রোদ পোয়াচ্ছিস বিনি কাজে। পুরাণ-কথা শুনেছি, উমা তপ করেছিলেন ঘর ছেড়ে বাইরে, রোদে পুড়ে; তোর কি তাই হোলো ?

প্রকৃতি

হাঁ মা, তপ করছি তো বটে।

মা

অবাক করলে! কার জন্যে ?

প্রকৃতি

যে আমাকে ডাক দিয়েছে।

গান

যে আমারে দিয়েছে ডাক দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক্ ॥
যে আমারি নাম জেনেছে ওগো তারি
নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্ ॥

মা

কিসের ডাক ?

প্রকৃতি

আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে "জল দাও।"

মা

পোড়া কপাল! তোকে বলেছে—'জল দাও'! কে শুনি! তোর আপন জাতের কেউ ?

প্রকৃতি

তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জাতেরই।

মা

জাত লুকোসনি ? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী ?

প্রকৃতি

বলেছিলেম। তিনি বললেন, মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।

মা

তোর মুখে এ সব কী শুনছি? তোর কি মনে পড়েছে পূর্ব্বজন্মের কোনো কাহিনী?

প্রকৃতি

এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের।

মা

হাসালি তুই। নতুন জন্ম! ঘটল কবে?

প্রকৃতি

সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীতবসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ। বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে। প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গণ্ডূষ জল, যাঁর পায়ের ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক।

মা

ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাৎ এত বড়ো হোলো তোর বুকের পাটা! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিসনে কোন কুলে তোর জন্ম?

প্রকৃতি

কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হোলো সেই জল। সাতসমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।

মা

তোর মুখের কথা সুদ্ধু বদলে গেছে যে! জাদু করেছে তোর কথাকে। কী বলিস নিজে বুঝতে পারিস কিছু?

প্রকৃতি

সমস্ত শ্রাবস্তী নগরে আর কি কোথাও জল ছিল না মা? এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে? এ'কেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহা-

পুণ্যই খুঁজছিলেন। যে-জলে ব্রত হোলো পূর্ণ সে জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীর্থেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে জল তুলে এনেছিল গুহক চণ্ডাল। সেই অবধি নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্চি দিনরাত—দাও জল, দাও জল।

গান

বলে দাও জল, দাও জল।
দেব আমি, কে দিয়েছে হেন সম্বল॥
কালো মেঘ পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহ্বল—
দাও জল দাও জল॥
ভূমিতলে হারা
উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।

কার সুগভীর বাণী

দিল হানি

কালো শিলাতল—

দাও জল দাও জল

মা

কী জানি বাছা, ভালো ঠেকছে না। ওদের মন্তরের খেলা আমি বুঝি নে। আজ তোর কথা চিনছি নে, কাল তোর মুখ চিনতেই পারব না। ওদের এ যে প্রাণ-বদলানো মন্তর।

প্রকৃতি

চিনতে পার নি এতদিন। যিনি চিনেছেন তিনি চেনাবেন। তাই আছি তাকিয়ে। রাজদুয়ারে দুপুরের ঘণ্টা বাজে, মেয়েরা জল নিয়ে যায় ঘরে, শঙ্খচিল একলা ওড়ে দূর আকাশে, আমার ঘট নিয়ে এসে বসি কুয়োতলায় পথের ধারে।

মা

কার জন্যে?

প্রকৃতি

পথিকের জন্যে ?

মা

তোর কাছে কোন পথিক আসবে পাগলি ।

প্রকৃতি

সেই এক পথিক, মা, সেই এক পথিক। তাঁর মধ্যে আছে বিশ্বের সকল পথের সব পথিক। দিনের পর দিন চলে যায়, এলেন না তো। কোনো কথা না বলে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু রাখলেন না কেন কথা ? আমার মন যে হোলো মরুভূমির মতো, ধূ ধূ করে সমস্ত দিন, হূ হূ করে তপ্ত হাওয়া, সে যে পারছে না জল দিতে। কেউ এসে চাইলে না।

গান

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে॥

ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়,
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে
যে ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকাল।
ঝর্ণারে কে দিল বাধা
তাপের প্রতাপে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥

মা

তোর আজকেকার কথা কিছু বুঝতে পারছিনে, তোকে কী নেশা লেগেছে কী জানি। কী চাস, আমাকে সাদা করে বল্।

প্রকৃতি

আমি চাই তাঁকে। তিনি আচম্কা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এত বড়ো আশ্চর্য্য কথা! সেবিকা আমি এই কথাটি নিন তুলে ধুলোর থেকে তাঁর বুকের কাছে, এই ধুতরো ফুলটাকে।

মা

মনে রাখিস প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্তাও নেই কোনোখানে। অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াসনে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক্‌ সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্ব্বত্রই তোর অপরাধ।

প্রকৃতি

গান

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে॥
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরো থরো।

চরণ-পরশ দিয়ো দিয়ো
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
ধরার প্রণাম আমি
তোমার তরে ॥

মা

বাছা, কিছু কিছু বুঝতে পারি তোর কথা। তুই মেয়েমানুষ, সেবাতেই তোর পূজো, সেবাতেই তোর রাজত্ব। এক নিমিষে জাত ডিঙিয়ে যেতে পারে মেয়েরাই; ধরা পড়ে সবাই তারা রাজরাণীর অংশ, যদি হঠাৎ সরে পড়ে ভাগ্যের পর্দ্দাটা। সুযোগ তোর তো ঘটেছিল। মৃগয়ায় বেরিয়ে রাজার ছেলে এসেছিল তোরই এই কুয়োতলায়। মনে পড়ে তো?

প্রকৃতি

হাঁ মনে পড়ে।

মা

কেন গেলিনে রাজার ঘরে? রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল।

প্রকৃতি

ভুলেছিল না তো কী। ভুলেইছিল যে আমি মানুষ। পশু মারতে বেরিয়েছিল ;—চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।

মা

তবু তো শিকার বলেও ঐ মুখ লক্ষ্য করেছিল সে। আর, ভিক্ষু, সে কি নারী বলে চিনেছে তোমাকে ?

প্রকৃতি

বুঝবে না তুমি বুঝবে না। আমি বুঝেছি, এতদিন পরে সে-ই আমাকে প্রথম চিনেছে। সে বড়ো আশ্চর্য্য !

গান

ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি,
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি ॥
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার ॥
আমি তরুণ অরুণ লেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,

আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদ বৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার॥

প্রকৃতি

তাঁকে চাই মা। নিতান্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই আমার এজন্মের পূজার ডালি। অশুচি হবে না তাতে তাঁর চরণ। দেখুক সবাই আমার স্পর্দ্ধা। গৌরব করে বলতে চাই আমি তোমার সেবিকা—নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।

মা

মিছে রাগ করিস কেন বাছা। দাসীজন্মই যে তোর। বিধাতার লিখন খণ্ডাবে কে।

প্রকৃতি

ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি ভুলিসনে, মিথ্যে নিন্দে রটাসনে নিজের, পাপ সে পাপ! রাজার বংশে

কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।

মা

তোর সঙ্গে কথা কইতে পারি এমন কথা আমি জানিনে। তা ভালো, আমি নিজে যাব তাঁর কাছে। পায়ে ধরে বলব, তুমি অন্ন নিয়ে থাক সব ঘর থেকেই, আমার ঘরে কেবল এক গণ্ডূষ জল নিতে এসো।

প্রকৃতি

গান

না না, ডাকব না ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি, অন্তরে তার ডাক পাঠাব আনব ডেকে॥
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানিনে তো কোথায় চলে,
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে॥
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে,
গঙ্গাধারা মিশবে না কি কালো যমুনাতে।

আপনি কী সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে ॥

পৃথিবী যখন অনাবৃষ্টিতে ফেটে চৌচীর, কী হবে মা এক ঘটি জল সংগ্রহ করে? আপনি আসবে না মেঘ আপন টানে, আকাশ ভরে দিয়ে?

মা

এ সব কথা বলে লাভ কী? মেঘ আপনি আসে তো আসে, না আসে তো আসেই না। ক্ষেত খন্দ যদি শুকিয়ে যায় তাতে কার কিসের গরজ? আমরা আকাশে তাকিয়ে থাকি, আর কী করতে পারি!

প্রকৃতি

সে হবে না। তাকিয়ে বসে থাকব না, মন্তর জানিস তুই, সেই মন্তর হোক আমার বাহুবন্ধন, আনুক তাঁকে টেনে।

মা

ওরে সর্ব্বনাশী, বলিস কী! সাহস কেবলি বাড়ছে দেখি! আগুন নিয়ে খেলা! এরা কি সাধারণ

মানুষ! মন্তর খাটাব এদের পরে? শুনে বুক কেঁপে ওঠে।

প্রকৃতি

রাজার ছেলের বেলায় মন্তর পড়তে চেয়েছিলি কোন সাহসে?

মা

ভয় করিনে রাজাকে, সে শূলে চড়াতে পারে। কিন্তু এরা যে কিছুই করে না।

প্রকৃতি

আমি আর কোনো ভয় করিনে—ভয় করি, আবার যাব নেমে—আবার আপনাকে ভুলব, আবার ঢুকব আঁধার কোঠায়। সে যে মরণের বাড়া! আনতেই হবে তাঁকে, এত বড়ো কথা এত জোর করে বলছি এ কি আশ্চর্য্য নয়,—এই আশ্চর্য্যই তো ঘটিয়েছে সে। আরো আশ্চর্য্য কি ঘটবে না, আসবে না কি আমার পাশে? আমারি আধো আঁচলে বসবে না?

মা

তাঁকে আনতে পারি হয়তো, তুই তার মূল্য দিতে পারবি? তোর কিচ্ছুই থাকবে না বাকি!

প্রকৃতি

না কিছুই থাকবে না। আমার জন্মজন্মান্তরের সেই দায়, কিচ্ছুই থাকবে না, একেবারে সমস্তই মিটিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যাব। তাই তো চাই তাঁকে। কিচ্ছু থাকবে না আমার। আমার যুগ-যুগের অপেক্ষা করে থাকা এই জন্মেই সার্থক হবে, মন কেবলি তাই বলছে। সার্থক হবে। সেইজন্যেই তো শুনলুম এমন আশ্চর্য্য কথা—জল দাও। আজ জেনেছি আমিও পারি দিতে। এই কথা সবাই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দেব দেব, আজ আমার সব কিছু দেব বলেই বসে আছি তাঁর পথ চেয়ে।

মা

তুই ধর্ম্ম মানিস নে ?

প্রকৃতি

কী করে বলব! তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন। যে ধর্ম্ম অপমান করে সে ধর্ম্ম মিথ্যে। অন্ধ করে মুখ বন্ধ করে—সবাই মিলে সেই ধর্ম্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু সেদিন থেকে এই ধর্ম্ম মানা আমার বারণ। কোনো ভয় আর নেই আমার—

পড়্ তোর মন্তর, ভিক্ষুকে নিয়ে আয় চণ্ডালের মেয়ের পাশে। আমিই দেব তাঁকে সম্মান। এত বড়ো সম্মান আর কেউ দিতে পারবে না।

গান

আমি তারেই জানি তারেই জানি
আমায় যে জন আপন জানে,—
তারি দানে দাবী আমার
যার অধিকার আমার দানে॥
যে আমারে চিনতে পারে
সেই চেনাতেই চিনি তারে,
একই আলো চেনার পথে
তার প্রাণে আর আমার প্রাণে॥
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা,
আমি তাদের মধ্যে আপন-হারা।
ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি,
ঘুমের ঢাকা গেল ফাটি,
নয়ন আমার ছুটেছে, তার
আলো-করা মুখের পানে॥

মা

শাপ লাগার ভয় করিসনে তুই ?

প্রকৃতি

শাপ তো লেগেই আছে জন্মকাল থেকে। এক শাপের বিষে আর এক শাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায়। কোনো কথাই শুনব না মা শুনব না, শুনব না। সুরু করে দে মন্ত্র। পারব না দেরি সইতে।

মা

আচ্ছা, তা হোলে কী নাম তাঁর বল্।

প্রকৃতি

তাঁর নাম আনন্দ

মা

আনন্দ ? ভগবান বুদ্ধের শিষ্য ?

প্রকৃতি

হাঁ সেই ভিক্ষু।

মা

তুই আমার বুক-চেরা ধন, আমার চোখের মণি,— তোর কথাতেই এত বড়ো পাপে হাত দিচ্চি।

প্রকৃতি

কিসের পাপ! যিনি সবাইকেই কাছে আনেন তাঁকে কাছে আনব তাতে দোষ হয়েছে কী?

মা

ওঁরা পুণ্যের জোরে টেনে আনেন মানুষকে। আমরা মন্তর পড়ে টানি, পশুকে টানে যে-ফাঁসে। আমরা মথন করে তুলি পাঁক।

প্রকৃতি

ভালোই সে ভালোই, নইলে পঙ্কোদ্ধার হয় না।

মা

ওগো তুমি মহাপুরুষ, অপরাধ করবার শক্তি আমার যত, ক্ষমা করবার শক্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি তবু প্রণাম গ্রহণ করো।

প্রকৃতি

কিসের ভয় তোমার মা! মন্ত্র আমিই পড়ছি মায়ের মুখ দিয়ে। আমার বেদনা যদি আনে তাঁকে টেনে, আর তাই যদি হয় অপরাধ, তবে করবই অপরাধ,

করবই। যে বিধানে কেবল শাস্তিই আছে সান্ত্বনা নেই মানব না সে বিধানকে।

গান

দোষী করো, দোষী করো।
ধূলায়-পড়া ম্লান কুসুম
পায়ের তলায় ধরো॥
অপরাধে ভরা ডালি
নিজ হাতে করো খালি,
তারপরে সেই শূন্য ডালায়
তোমার করুণা ভরো॥
তুমি উচ্চ আমি তুচ্ছ, ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।
আমার দোষকে তোমার পুণ্য
করবে তো কলঙ্কশূন্য,
ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি
গলায় তোমার পরো॥

মা

আচ্ছা সাহস তোর প্রকৃতি।

প্রকৃতি

আমার সাহস! ভেবে দেখ্ তাঁর সাহসের জোর! কেউ যে-কথা আমার কাছে বলতে পারেনি তিনি সহজেই বললেন—জল দাও। ঐটুকু বাণী, তার তেজ কত,—আলো করে দিলে আমার সমস্ত জন্ম, বুকের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিসনি। সমস্ত সকালবেলা ভিক্ষা শেষ করলেন শ্রাবস্তীনগরে, এলেন মাঠ পেরিয়ে, শ্মশান পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, প্রখর রৌদ্র মাথায় করে। কিসের জন্যে? আমার মতো মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্যে—জল দাও। মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া এত প্রেম! নামল সেই ভীরুর কাছে যে সবার চেয়ে অযোগ্য। আর কিসের ভয় আমার! জল দাও! সেই জল-যে আমার এ জন্ম ভরে উপচে উঠেছে, না দিতে পারলে তো বাঁচব না। জল দাও! এক নিমেষে জেনেছি জল আছে আমার, অফুরান জল, সে আমি জানাব কাকে? তাই তো ডাকছি দিনরাত। শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর পড়ে। সইবে তাঁর সইবে।

মা

মাঠ-পারের রাস্তা দিয়ে ঐ যে কারা চলেছে প্রকৃতি, পীতবসন পরা।

প্রকৃতি

তাই তো, ও যে দেখছি সংঘের সব শ্রমণ। শুনছ না পড়ছেন মন্ত্র ?

(পথে শ্রমণেরা)

বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণা মহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞান লোচনো,
লোকস্‌স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং।

প্রকৃতি

মা, ঐ যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে। এই কুয়োতলার দিকে ফিরে তাকালেন না। আর একবার তো বলে যেতে পারতেন, জল দাও। মনে হয়েছিল আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না—আমি যে ওঁর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি। (বসে পড়ে বার-বার মাটিতে মাথা ঠুকে) এই মাটি, এই মাটি, এই

মাটিই তোর আপন—হতভাগিনী, কে তোকে আলোতে ফুটিয়ে তুলেছিল এক মুহূর্ত্তের জন্যে ? তাকে কি দয়া বলে ? শেষে পড়তে হোলো এই মাটিতেই—চিরদিন মিশিয়ে থাকতে হবে এই মাটিতেই, যত লোক চলে রাস্তায় তাদের পায়ের তলায়।

মা

বাছা, ভুলে যা, ভুলে যা এ সমস্ত কিছু। তোর এক নিমেষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ওরা যাচ্চে চলে, যাক যাক। যা টেঁকবার নয় তা যত শীঘ্র যায় ততই ভালো।

প্রকৃতি

এই প্রতিদিনের চাই চাই চাই, এই প্রতি মুহূর্ত্তের অপমান, বুকের ভিতরে এই খাঁচার পাখীর পাখা-আছড়ে-মরা, একেই বলে স্বপ্ন ? যা বুকের সব শিরা কামড়ে ধরে থাকে ছাড়তে চায় না তাই স্বপ্ন ? আর ঐ ওরা, নেই কোনো বাঁধন, নেই কোনো সুখদুঃখ, নেই কোনো সংসারের বোঝা—ভেসে চলে যায় শরৎ-কালের মেঘের মতো—ওরাই আছে জেগে, ওরাই স্বপ্ন নয় ?

মা

তোর কষ্ট দেখতে পারিনে প্রকৃতি। ওঠ্ তুই। আনবই তাঁকে মন্ত্র পড়ে। নিয়ে আসব ধূলোর পথ দিয়েই। 'কিছু চাই না' বলার অহঙ্কার ভাঙব তাঁর,—'চাই চাই' বলেই আসতে হবে তাঁকে ছুটে!

প্রকৃতি

মা, তোমার মন্ত্র জীবসৃষ্টির আদিকালের। এদের মন্ত্র কাঁচা এই সেদিনকার! ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে। তোমার মন্ত্রের টানে খুলবে ওদের মন্ত্রের গাঁঠ। ওঁকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।

মা

কোথায় যাচ্চে ওরা?

প্রকৃতি

ওরা যায় এইমাত্র জানি, ওরা কোনোখানেই যায় না। বর্ষা আসবে কিছুদিন পরে তখন বসবে চাতুর্মাস্যে। আবার যাবে, কী জানি কোথায়। এ'কেই ওরা বলে জেগে থাকা!

মা

পাগলি, তবে কী বলছিস মন্তরের কথা? চল্লে যাচ্চে কত দূরে,—কোথা থেকে আনব ফিরিয়ে?

প্রকৃতি

যেখানেই যাক ফেরাতেই হবে, দূর নেই তোর মন্তরের কাছে।

গান

যায় যদি যাক সাগরতীরে।
আবার আসুক, আবার আসুক, আসুক ফিরে!
রেখে দেব আসন পেতে
হৃদয়েতে,
পথের ধূলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুনীরে॥
যায় যদি যাক শৈলশিরে
আসুক ফিরে আসুক ফিরে।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়
ডাকব উহায়,
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে॥

আমাকে করলে না দয়া, আমি ওকে দয়া করব না। তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠুর মন্ত্র, পড়িস তাই—পাকে পাকে দাগ দিয়ে দিয়ে জড়াক ওর মনকে। যাবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন?

মা

ভাবনা করিসনে। অসাধ্য হবে না। তোকে দেব মায়াদর্পণ। সেইটি হাতে নিয়ে নাচবি। তার ছায়া পড়বে তাতে। সেই আয়নাতেই দেখতে পাবি কী হোলো তার, কতদূর সে এল।

প্রকৃতি

ঐ দেখ্ পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ। মন্ত্র খাটবে না, খাটবে। উড়ে যাবে শুষ্ক সাধন, শুকনো পাতার মতো। নিববে বাতি। পথ দেখা যাবে না, ঘুরে ঘুরে এসে পড়বে এই দরজায়, নিশীথরাতে ঝড়ে বাসাভাঙা পাখী যেমন করে এসে পড়ে অন্ধকার আঙিনায়। বুক দুরদুর করছে, মনের মধ্যে ঝিলিক দিচ্চে বিজুলি, ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঢেউ উঠছে যে-সমুদ্রে, তার পার দেখিনে।

মা

এখনো ভেবে দেখ্। মাঝখানে তো আঁৎকে উঠবিনে ভয়ে? ধৈর্য্য থাকবে তোর? মন্ত্রের বেগ চড়ে যাবে যখন, হঠাৎ ঠেকাতে গেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। জ্বলবার জিনিষ সমস্ত যাবে ছাই হয়ে তবে নিববে আগুন, এই কথাটা মনে রাখিস।

প্রকৃতি

তুই ডরছিস কার জন্যে? সে কি তেমনি মানুষ? কিছুতে কিছু হবে না তার—শেষ পর্য্যন্তই আসুক সে চলে, আগুনের পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। আমি মনের মধ্যে দেখতে পাচ্চি সামনে প্রলয়ের রাত্রি, মিলনের ঝড়, ভাঙনের আনন্দ।

গান

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু,
ঘন মেঘের ভুরু, কুটিল কুঞ্চিত,
হোলো রোমাঞ্চিত বন বনান্তর;
দুলিল চঞ্চল বক্ষ হিন্দোলে
মিলন স্বপ্নে সে কোন অতিথি রে
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্র-সচকিত ত্রস্ত শর্ব্বরী,
মালতী-বল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে,
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝঙ্কৃত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি

বুক ফেটে যাবে! আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না। কী ভয়ঙ্কর দুঃখের ঘূর্ণিঝড়! বনস্পতি শেষকালে কি মড়মড় করে লুটোবে ধূলোয়, অভ্রভেদী গৌরব তার পড়বে ভেঙে ?

মা

দেখ্‌ বাছা, এখনো যদি বলিস, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি আমার মন্ত্রকে। তাতে আমার নাড়ী ছিঁড়ে যায় যদি, যায় নিজের প্রাণ, সেও ভালো। কিন্তু ঐ মহাপ্রাণ রক্ষে পাক্‌।

প্রকৃতি

সেই ভালো মা, থাক্‌ তোমার মন্ত্র। আর কাজ নেই।—না না না না—পথ আর কতখানিই বা! শেষ পর্য্যন্ত আসতে দে তাকে, আসতে দে, আমার এই

বুকের কাছ পর্য্যন্ত। তারপরে সব দুঃখ দেব মিটিয়ে, আমার বিশ্বসংসার উজাড় করে দিয়ে। গভীর রাত্রে এসে পৌঁছবে পথিক, সমস্ত বুকের জ্বালা দিয়ে জ্বালিয়ে দেব প্রদীপ, আছে সুধার ঝরণা গভীর অন্তরে, তারি জলে অভিষেক হবে তার—যে শ্রান্ত যে তপ্ত যে ক্ষত বিক্ষত। আর একবার সে চাইবে, জল দাও, আমার হৃদয়-সমুদ্রের জল। আসবে সেইদিন। তোর মন্ত্র চলুক, চলুক।

গান

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতলজলে বিপুল বেদনার॥
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালী,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার॥

মা

এত দেরি হবে জানতুম না, বাছা আমার মন্ত্র শেষ হোলো বুঝি! আমার প্রাণ যে কণ্ঠে এসেছে।

প্রকৃতি

ভয় নেই মা, আর একটু সয়ে থাক্! একটুখানি! বেশি দেরি নেই।

মা

আষাঢ় তো পড়েছে, ওঁদের চাতুর্ম্মাস্থ তো আরম্ভ হোলো।

প্রকৃতি

ওঁরা গেছেন বৈশালীতে গোশিরসংঘে।

মা

কী নিষ্ঠুর তুই! সে যে অনেক দূর।

প্রকৃতি

বহুদূর নয়। সাত দিনের পথ। পনেরো দিন তো কেটে গেল। এতদিনে মনে হচ্চে টলেছে আসন, আসছে আসছে, যা বহুদূর, যা লক্ষযোজন দূর, যা চন্দ্রসূর্য্য পেরিয়ে, আমার দু-হাতের নাগাল থেকে যা অসীম দূরে তাই আসছে কাছে। আসছে, কাঁপছে আমার বুক ভূমিকম্পে।

মা

মন্ত্রের সব অঙ্গ পূর্ণ করেছি—এতে বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আনতে পারত টেনে। তবু দেরি হচ্চে। কী মরণান্তিক যুদ্ধই চলছে। কী দেখেছিলি তুই আয়নাতে ?

প্রকৃতি

প্রথম দেখেছি আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাকাশে মুখের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোচ্চে আগুন। তার পরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল—ফুলে-ওঠা ফেটে-পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো—লাল হয়ে উঠল রং। সেদিন গেল। পরের দিন দেখি পিছনে ঘন কালো মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—জ্বলছে আগুন সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে। আমার রক্ত এল হিম হয়ে। ছুটে তোকে বল্‌তে গেলুম—এখনি দে তোর মন্ত্র বন্ধ করে। গিয়ে দেখি তুই শিবনেত্র, কাঠের মতো বসে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, জ্ঞান নেই। মনে হোলো তোর মধ্যেও কোনোখানে দাউ দাউ জ্বলছে আগুন। যে পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে, তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস্ ফোঁস্ করে তাকে ছোবল

মারছে, চলছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ফিরে এসে আয়না তুলে দেখি আলো গেছে—শুধু দুঃখ দুঃখ দুঃখ, অসীম দুঃখের মূর্ত্তি।

মা

মরে পড়ে গেলিনে তাই দেখে! তারি তো ঝলক লেগেছিল আমার প্রাণের মধ্যে, মনে হোলো আর সইবে না।

প্রকৃতি

যে দুঃখের রূপ দেখেছি সে তো তাঁর একলার নয়, সে আমারও; আমাদের দু-জনের। ভীষণ আগুনে গলে মিশেছে সোনার সঙ্গে তাঁবা।

মা

ভয় হোলো না তোর মনে ?

প্রকৃতি

ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি—মনে হোলো দেখলুম সৃষ্টির দেবতা, প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ঙ্কর—আগুনকে চাবকাচ্ছেন তাঁর কাজে, আর আগুন কেবলি গোমরাচ্চে গর্জ্জাচ্চে। সপ্তধাতুর কৌটোতে কী আছে

তাঁর পায়ের সামনে—প্রাণ না মৃত্যু? আমার মনে ফুলতে লাগল একটা আনন্দ। তাকে কী বলব? বলব নতুন সৃষ্টির বিরাট বৈরাগ্য। ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দুঃখ নেই,—ভাঙছে, জ্বলে উঠছে, গলে যাচ্চে, ছিট্‌কে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ। থাকতে পারলুম না, আমার সমস্ত শরীর মন নেচে নেচে উঠল, অগ্নিশিখার মতো।

গান

হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর,
ওহে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর।
হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম-
দংশনে জর্জ্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝনঝন, ঝননন ঝননন
পিণাক টঙ্কারো॥

মা

কী রকম দেখলি তোর ভিক্ষুকে?

প্রকৃতি

দেখলুম তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি বহুদূরে তাকিয়ে,

গোধূলি আকাশের তারার মতো। ইচ্ছে হোলো আপনার কাছ থেকে চলে যাই অনন্ত যোজন দূরে।

মা

তুই আয়নার সামনে তখন নাচছিলি—তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন।

প্রকৃতি

ধিক্ ধিক্ কী লজ্জা! মনে হচ্ছিল থেকে থেকে চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন। আবার তখনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দলে ফেলছেন রাগের অঙ্গারগুলো। শেষকালে দেখলেম তাঁর রাগ ফিরল কাঁপতে কাঁপতে শেলের মতো নিজের দিকে—বিঁধল গিয়ে মর্মের মধ্যে।

মা

সমস্ত সহ্য করলি তুই?

প্রকৃতি

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমি, এই আমি, এই তোমার মেয়ে, কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই—তাঁর দুঃখ আর এর দুঃখ আজ এক। কোন

সৃষ্টির যজ্ঞে এমন ঘটে—এত বড়ো কথা কেউ কোনো-দিন ভাবতে পারত ?

মা

এই উৎপাত শান্ত হবে কতদিনে ?

প্রকৃতি

যতদিন না আমার দুঃখ শান্ত হবে। ততদিন দুঃখ তাঁকে দেবই। আমি মুক্তি যদি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে ?

মা

তোর আয়না শেষ দেখেছিস কবে ?

প্রকৃতি

কাল সন্ধ্যেবেলায়। বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তার পরে কখনো দেখেছি নদী পেরলেন খেয়া নৌকোয়, দেখেছি দুর্গম পাহাড়ে, দেখেছি সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, মাঠে তিনি একা, দেখেছি অন্ধকারে গভীর রাত্রে বনের পথে। যত যাচ্ছে দিন, স্বপ্নের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন

কোনো বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে দিয়ে। মুখে একটা বিহ্বলতা, দেহে একটা শৈথিল্য—দুই চোখের সামনে যেন বস্তু নেই, নেই সত্য মিথ্যা, নেই ভালোমন্দ, আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোনো অর্থ।

মা

আজ কোথায় এসেছেন আন্দাজ করতে পারিস ?

প্রকৃতি

কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছি উপলী নদীর ধারে পাটল গ্রামে। নববর্ষায় জলের ধারা উন্মত্ত,—ঘাটের কাছে পুরোনো পিপুল গাছ—জোনাকি জ্বলছে ডালে ডালে, তলায় শেওলা-ধরা বেদী—সেইখানে এসেই হঠাৎ চম্‌কে দাঁড়ালেন। অনেকদিনের চেনা জায়গা, শুনেছি ঐখানে বসে ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজা সুপ্রভাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বপ্ন বুঝি ভাঙল হঠাৎ। তখনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেম আয়না—ভয় হোলো কী জানি কী দেখব। তারপরে গেছে সমস্ত দিন, কিছু জানতে চাইনি, আশা করছি, আশা ছাড়ছি—এমনি

করে আছি বসে।—এখন রাত আসছে অন্ধকার হয়ে। প্রহরী হাঁক দিয়ে চলেছে রাস্তায়, এক প্রহর গেল বুঝি কেটে! আর সময় নেই, সময় নেই মা, এ রাত ব্যর্থ করিসনে। তোর সব জোরটা দে ঐ মন্ত্রে।

মা

আর পারছিনে বাছা। মন্ত্র দুর্ব্বল হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।

প্রকৃতি

দুর্ব্বল হোলে চলবে না। দিসনে হাল ছেড়ে। ফেরবার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন বা, বাঁধনে শেষ টান পড়েছে—হয়তো টিঁকবে না। হয়তো বেরিয়ে যাবেন আমার এ জন্মের সংসার থেকে, আর পাব না নাগাল কিছুতেই। তখন আমারই স্বপ্নের পালা, আবার চণ্ডালিনীর মায়ামূর্ত্তি। পারব না সইতে সেই মিথ্যে। পায়ে পড়ি মা, দে একবার তোর সমস্ত শক্তি। এবার সুরু কর্ তোর বসুন্ধরা মন্ত্র, টলতে থাক্ পুণ্যবানদের তুষিত স্বর্গলোক।

গান

আমি তোমারি মাটির কন্যা,
জননী বসুন্ধরা।
তবে আমার মানবজন্ম
কেন বঞ্চিত করা॥
পবিত্র জানি যে তুমি
পবিত্র জন্মভূমি,
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা
প্রাণের পুণ্যে ভরা॥
কোন স্বর্গের তরে
ওরা তোমায় তুচ্ছ করে,
রহি' তোমার বক্ষ পরে।
আমি যে তোমারি আছি
নিতান্ত কাছাকাছি,
তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে
হৃদয়-প্রাণহরা॥

মা

যেমন বলেছিলেম তেমনি প্রস্তুত হয়েছ তো?

প্রকৃতি

হয়েছি। কাল ছিল শুক্লাদ্বিতীয়ার রাত, করেছি গম্ভীরায় অবগাহন স্নান। এই তো চাল দিয়ে, দাড়িমের ফুল দিয়ে, সিঁদূর দিয়ে, সাতটি রত্ন দিয়ে, চক্র এঁকেছি আঙিনায়। পুঁতেছি হলদে কাপড়ের ধ্বজাগুলি, থালায় রেখেছি মালাচন্দন, জ্বালিয়েছি বাতি। স্নানের পর কাপড় পরেছি ধানের অঙ্কুরের রং, চাঁপার রঙের ওড়না—পূব দিকে আসন করে সমস্ত রাত ধ্যান করেছি তাঁর মূর্ত্তি। ষোলোটি সোনালি সুতোয় ষোলোটি গ্রন্থি দিয়ে রাখী পরেছি বাঁ হাতে।

মা

আচ্ছা, তবে নাচো তোমার সেই আহ্বানের নাচ—প্রদক্ষিণ করো। আমি বেদীর কাছে মন্ত্র পড়ছি।

গান

মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো
সৌরভ অমৃতে।
মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো
গৌরব নিশীথে॥

এই মূল্যহারা মম শুক্তি
এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি,
মম মৌনী বীণার তারে তারে
এসো সঙ্গীতে ॥
নব অরুণের এসো আহ্বান
চির রজনীর হোক অবসান, এসো।
এসো শুভস্মিত শুকতারায়,
এসো শিশির অশ্রুধারায়,
সিন্দুর পরাও উষারে
তব রশ্মিতে ॥

প্রকৃতি, এইবার তোমার আয়নাটা নিয়ে দেখো। দেখছ কালো ছায়া পড়েছে বেদীটার উপরে ? আমার বুক ভেঙে যাচ্চে পারছিনে। দেখো আয়নাটা, আর কত দেরি।

প্রকৃতি

না দেখব না দেখব না—আমি শুনব মনের মধ্যে ধ্যানের মধ্যে। হঠাৎ সামনে দেখব যদি দেখা দেন। আর একটু সয়ে থাকো মা—দেবেন দেখা, নিশ্চয় দেবেন। ঐ দেখো হঠাৎ এল ঝড়, আগমনীর ঝড়,

পদভরে পৃথিবী কাঁপছে থরথরিয়ে, বুক উঠছে গুরগুর করে।

মা

আনছে তোর অভিশাপ হতভাগিনী। আমাকে তো মেরে ফেললে! ছিঁড়ল বুঝি শিরাগুলো।

প্রকৃতি

অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে। ভাঙল দরজা, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে। ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে দুলছে আমার প্রাণ। ও আমার সর্ব্বনাশ, ও আমার সর্ব্বস্ব, তুমি এসেছ—আমার সমস্ত অপমানের চূড়ায় তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন। আমার লজ্জা দিয়ে ভয় দিয়ে আনন্দ দিয়ে।

সময় হয়ে আসছে আমার। আর পারছিনে। শীগ্‌গির দেখ্ তোর আয়নাটা!

প্রকৃতি

মা ভয় হচ্চে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে—

তার পরে? তারপরে কী? শুধু এই আমি! আর কিচ্ছু না। এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্যে এত দীর্ঘ এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে!

গান

পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়
কী আছে শেষে?
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে?
ঢেউ ওঠে-পড়ে কাঁদার,
সম্মুখে ঘন আঁধার,
পার আছে কোন দেশে
আজ ভাবি মনে মনে
মরীচিকা অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই
মনে ভয় লাগে সেই,
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে॥

মা

ও নিষ্ঠুর মেয়ে, দয়া কর্ আমাকে। আমার আর সহ্য হয় না। শীগ্‌গির আয়নাটা দেখ্।

প্রকৃতি

(আয়নাটা দেখেই ফেলে দিল) মা, ওমা, ওমা, রাখ্ রাখ্ রাখ্ রাখ্, ফিরিয়ে নে ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র! এখনি, এখনি! ওরে ও রাক্ষুসী, কী করলি, কী করলি, তুই মরলিনে কেন? কী দেখলেম! ওগো কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জ্বল সেই শুভ্র নির্ম্মল সেই সুদূর স্বর্গের আলো! কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে! মাথা হেঁট করে এল! যাক, যাক, এ সব যাক—(পা দিয়ে মন্ত্রের উপকরণ ভেঙে ছড়িয়ে ফেললে)—ওরে তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান করিস নে বীরের। জয় হোক তাঁর জয় হোক!

(আনন্দের প্রবেশ)

প্রভু এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে—তাই এত দুঃখই পেলে—ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর করে দাও। টেনে এনেছি